# অরুণা আসফ আলি : স্বাধীনতা আন্দোলনের বীরাঙ্গনা

### অনির্বাণ রায় চৌধুরী

### পতাকা থেকে শ্রেণিসংগ্রাম—এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার

ইতিহাসের কিছু ছবি সময়কে অতিক্রম করে যায়। ১৯৪২-এর ৯ আগস্ট বোম্বাইয়ের গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে তেমনই একটি ছবি তৈরি হয়েছিল—এক তরুণী নারী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন। আগের রাতেই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সমস্ত প্রধান নেতাকে গ্রেফতার করেছে ব্রিটিশ সরকার। তাদের ধারণা ছিল, নেতৃত্বকে বন্দি করলেই আন্দোলনের প্রাণশক্তিকে বন্দি করা যাবে। কিন্তু অরুণা আসফ আলির হাতে উঠে যাওয়া পতাকা সেই হিসাবকে ভুল প্রমাণ করেছিল।

অরুণা আসফ আলি শুধু ১৯৪২-এর এক সাহসী নারী নন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে বুঝতে হলে স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয়তাবাদী পরিসর পেরিয়ে যেতে হয় শ্রমিকের অধিকার, সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা এবং শ্রেণি-প্রশ্নের অথর্নৈতিক মুক্তি।

## সামাজিক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ

১৯০৯ সালের ১৬ জুলাই কালকায় জন্ম অরুণা গঙ্গোপাধ্যায়ের। এক বাঙালি, ব্রাহ্মসমাজ-প্রভাবিত পরিবারে তাঁর বেড়ে ওঠা। সেই সময়ের সামাজিক বাস্তবতায় মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত হলেও অরুণা লাহোরের Sacred Heart Convent এবং নৈনিতালের All Saints' College-এ পড়াশোনা করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে কলকাতার গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলে শিক্ষকতাও শুরু করেন। অথর্াৎ তাঁর জীবনের প্রথম পরিচয় ছিল শুধু একজন শিক্ষিত নারী হিসেবে নয়—একজন শিক্ষিকা হিসেবেও। আর এই শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাই পরবর্তী সময়ে তাঁর নারীশিক্ষা ও সামাজিক মুক্তির ভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও ছিল তৎকালীন সামাজিক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে এক ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য। ১৯২৮ সালে দিল্লির বিশিষ্ট আইনজীবী ও জাতীয়তাবাদী নেতা আসফ আলির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ধর্মীয় পরিচয়, বয়সের পার্থক্য এবং তৎকালীন সমাজের নানা প্রচলিত মানদণ্ডকে অতিক্রম করে নেওয়া এই সিদ্ধান্ত নিছক ব্যক্তিগত পছন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পরবর্তী সময়ে যে অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিবাদী ও স্বাধীনচেতা রাজনৈতিক অরুণাকে আমরা দেখতে পাই, তাঁর ব্যক্তিজীবনের এই সিদ্ধান্তের মধ্যেও তার পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

তবে অরুণার বিদ্রোহের প্রকৃত রাজনৈতিক পরিসর তৈরি হয় খুব দ্রুতই। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং গ্রেফতার হন। কারাবাস

তাঁর রাজনৈতিক চেতনাকে আরও দৃঢ় করে। জেলের ভিতরেও বন্দিদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন তিনি। ফলে স্বাধীনতার প্রশ্ন তাঁর কাছে ক্রমশ কেবল বিদেশি শাসকের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন থাকেনি; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মানুষের মযর্াদা, অধিকার এবং সমতার প্রশ্ন।

এই জায়গাটিই অরুণার রাজনৈতিক বিকাশের গুরুত্বপূণর্ ভিত্তি। ব্যক্তিজীবনে সামাজিক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে অবস্থান, শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি আগ্রহ এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সক্রিয়তা—এই তিনটি ধারা ধীরে ধীরে এক জায়গায় এসে মিশতে শুরু করে।

# শিক্ষা : শুধু জ্ঞান নয়, মুক্তির হাতিয়ার

অরুণা আসফ আলির রাজনৈতিক জীবনকে বুঝতে গেলে তাঁর শিক্ষা-ভাবনাকে আলাদা করে দেখা জরুরি। কারণ তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল না কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি বা পরীক্ষায় সাফল্যের পথ; শিক্ষা ছিল চেতনা নিমর্াণ, সামাজিক পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা এবং বিশেষত নারীর আত্মমুক্তির হাতিয়ার।

এই ভাবনার ভিত্তি তাঁর নিজের জীবনেই। এমন এক সময়ে তিনি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, যখন ভারতীয় সমাজে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা এখনও সবর্জনীন অধিকার হয়ে ওঠেনি। লাহোর ও নৈনিতালে পড়াশোনা শেষ করে কলকাতার গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলে শিক্ষকতাও করেন তিনি। ফলে শিক্ষা তাঁর কাছে শুধু অর্জিত জ্ঞান ছিল না; শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, মেয়েদের শিক্ষার প্রসার তাদের সামাজিক অবস্থান ও আত্মনির্ভরতার প্রশ্নের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।

এই উপলব্ধিই তাঁকে নারীশিক্ষার বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে। ১৯২৯ সালে রাজকুমারী অমৃত কৌর, সরোজিনী নাইডু-সহ বিশিষ্ট নারীদের সঙ্গে তিনি **All India Women's Education Fund Association**-এর প্রতিষ্ঠার কাজে যুক্ত হন। নারীশিক্ষাকে তাঁরা দেখেছিলেন সামাজিক পরিবতর্নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে।

অরুণার ভাবনার রাজনৈতিক তাৎপর্য এখানেই—নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানে তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থেকেও দূরে রাখা। তাই নারীশিক্ষা তাঁর কাছে দয়া বা কল্যাণের বিষয় নয়; ছিল অধিকার, আত্মমযর্াদা এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের প্রশ্ন।

পরবতর্ী সময়ে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা যখন কংগ্রেস সোশ্যালিজম পেরিয়ে আরও স্পষ্ট বামপন্থী অবস্থানের দিকে এগোয়, তখন শিক্ষার প্রশ্নও বৃহত্তর সামাজিক মুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠে। শ্রেণি, লিঙ্গ ও অথর্নৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে জ্ঞান ও শিক্ষার সুযোগের অসম বণ্টন যে সমাজের বৈষম্যকে পুনরুৎপাদন করে, অরুণার রাজনৈতিক জীবন সেই প্রশ্নকেই সামনে আনে।

তাঁর জীবন তাই শিক্ষা থেকে রাজনীতির একটি স্বাভাবিক সেতু তৈরি করে—শিক্ষা মানুষকে প্রশ্ন করতে শেখায়, প্রশ্ন তাকে সমাজের বৈষম্য চিনতে শেখায়, আর সেই চেতনা তাকে পরিবতর্নের সংগ্রামে নিয়ে যেতে পারে।

এই অর্থে অরুণার কাছে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল শুধু ‘শিক্ষিত’ মানুষ তৈরি করা নয়, স্বাধীন মানুষ তৈরি করা। এমন মানুষ, যে নিজের অধিকার জানবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলবে এবং সমাজের বৈষম্যকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেবে না। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর ভাবনা তাই কেবল বিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; তার লক্ষ্য ছিল নারীর নিজের জীবন, শ্রম, চিন্তা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি করা।

আজ শিক্ষাকে যখন ক্রমশ বাজার, প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিগত ক্যারিয়ারের সাফল্যের মাপকাঠিতে বিচার করার প্রবণতা বাড়ছে, তখন অরুণার শিক্ষা-ভাবনা নতুন করে প্রাসঙ্গিক। তাঁর জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়—শিক্ষার প্রকৃত সামাজিক মূল্য তখনই, যখন তা স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিবোধ, সমতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস তৈরি করে।

এই কারণেই অরুণা আসফ আলির শিক্ষা-ভাবনা জাতীয় মুক্তির সীমানা পেরিয়ে সামাজিক মুক্তির প্রশ্নে পৌঁছায়। তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল এমন এক শক্তি, যা মানুষকে শুধু পৃথিবী সম্পর্কে জানতে শেখায় না—পৃথিবীকে বদলানোর প্রয়োজনীয়তাও বুঝতে শেখায়।

## কারাগার থেকে গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক—জাতীয় মুক্তি থেকে শ্রেণিচেতনার পথে

১৯৩০-এর দশকের কারাবাস অরুণা আসফ আলিকে ভেঙে দেয়নি; বরং তাঁর রাজনৈতিক চেতনা আরও দৃঢ় করেছিল। বন্দিদের অধিকার ও কারাগারের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেন। ১৯৪১ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহেও অংশ নিয়ে আবার গ্রেফতার হন। স্বাধীনতার প্রশ্ন তাঁর কাছে ক্রমশ মানুষের মযরাদা ও অধিকারের প্রশ্নে পরিণত হচ্ছিল।

কিন্তু ১৯৪২ তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তৈরি করে এক ঐতিহাসিক বাঁক।

৮ আগস্ট বোম্বাইয়ের গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ‘ভারত ছাড়ো’ প্রস্তাব গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকার পরদিন ভোরেই গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল, আজাদ-সহ কংগ্রেসের শীষর্ নেতাদের গ্রেফতার করে। উদ্দেশ্য ছিল নেতৃত্বকে সরিয়ে গণআন্দোলনকে স্তব্ধ করা।

৯ আগস্ট সেই হিসাবকে ভেঙে দিলেন অরুণা।

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে বিপুল জনসমাবেশের সামনে তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরবতর্ী সময়ে স্থানটি পরিচিত হয় **আগস্ট ক্রান্তি ময়দান** নামে। পতাকা উত্তোলনের ঘটনাটি হয়ে ওঠে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম প্রতীকী মুহূতর্।

এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার। অরুণা আত্মগোপনে চলে যান। কিন্তু তা ছিল না নিষ্ক্রিয় আত্মগোপন।

প্রকাশ্য সভা-মিছিলের পথ যখন রাষ্ট্র বন্ধ করে দিয়েছে, তখন তিনি আত্মগোপনে থেকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রচার, যোগাযোগ ও সংগঠনের কাজ চালিয়ে যান।

এই সময় তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল গোপন প্রচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকা। ব্রিটিশ সেন্সরশিপ ও দমননীতির মধ্যেও আন্দোলনের খবর ও রাজনৈতিক বাতর্া মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলতে থাকে। ফলে অরুণার সংগ্রাম শুধু প্রতীকী পতাকা উত্তোলনে সীমাবদ্ধ থাকেনি; তা পরিণত হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক প্রতিরোধে।

১৯৪৬ সালে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার হলে তিনি প্রকাশ্যে ফিরে আসেন। কিন্তু ১৯৪২-এর অভিজ্ঞতা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায় স্থায়ী ছাপ ফেলে। তিনি উপলব্ধি করেন—রাষ্ট্রের দমনক্ষমতা যতই প্রবল হোক, সংগঠিত মানুষের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে স্থায়ীভাবে স্তব্ধ করা যায় না।

আর এখান থেকেই তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক প্রশ্নটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানই কি মানুষের পূর্ণ মুক্তি? যদি শ্রমিক শোষিত থাকে, কৃষক বঞ্চিত থাকে, নারী বৈষম্যের শিকার হয় এবং সম্পদ অল্প কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, তবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সামাজিক অর্থ কতটা পূর্ণ?

স্বাধীনতার পরে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট রাজনীতির দিকে তাঁর অগ্রসর হওয়ার পেছনে এই প্রশ্নগুলিরও গভীর ভূমিকা ছিল।

তাই গোয়ালিয়া ট্যাঙ্কে অরুণার উত্তোলিত পতাকা ছিল কেবল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক নয়; তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে সেই পতাকার অর্থ আরও বিস্তৃত হয়ে পৌঁছেছিল সামাজিক ন্যায়, অর্থনৈতিক সমতা ও শোষণমুক্ত সমাজের আকাঙ্ক্ষায়।

## স্বাধীনতা এল, কিন্তু অরুণার প্রশ্ন থামল না

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল। কিন্তু অরুণা আসফ আলির রাজনৈতিক যাত্রা সেখানে থেমে গেল না। বরং এখান থেকেই তাঁর চিন্তার একটি মৌলিক পরিবর্তন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম সফল হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজে শ্রেণিবৈষম্য, দারিদ্র্য, শ্রমিক শোষণ, নারী-অবদমন—এসব কি শেষ হয়েছে?

অরুণার উত্তর ছিল না।

তিনি কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা তাঁকে আরও স্পষ্ট বামপন্থী অবস্থানের দিকে নিয়ে যায়। ১৯৫০-এর দশকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হন এবং দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হন এবং অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভূমিকা নেন।

এখানে অরুণার রাজনৈতিক বিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যে নারী ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পতাকা তুলেছিলেন, স্বাধীনতার পরে তিনিই প্রশ্ন তুললেন—রাষ্ট্র বদলালেই কি সমাজ বদলায়?

জাতীয় পতাকা স্বাধীন হলেই কি শ্রমিক স্বাধীন হয়?

রাজনৈতিক ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে এলেই কি অর্থনৈতিক ক্ষমতা মানুষের হাতে আসে?

এই প্রশ্নই তাঁকে সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট চিন্তার দিকে নিয়ে যায়।

অরুণার কাছে স্বাধীনতা তাই ক্রমশ দ্বিস্তরীয় অর্থ লাভ করেছিল—প্রথমত ঔপনিবেশিক শাসন থেকে জাতীয় মুক্তি, দ্বিতীয়ত শোষণ ও বৈষম্য থেকে সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তি।

এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিই তাঁকে তাঁর সময়ের বহু জাতীয়তাবাদী নেতার থেকে আলাদা রাজনৈতিক অবস্থানে দাঁড় করায়।

## পতাকার পরে শ্রমিকের লড়াই, কলমের পরে মানুষের কথা

অরুণা আসফ আলির রাজনৈতিক উত্তরাধিকার শুধু দলীয় রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। সাংবাদিকতাকেও তিনি রাজনৈতিক চেতনা গঠনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। আসফ আলির সঙ্গে তিনি *Link* সাপ্তাহিক ও *Patriot* দৈনিক প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এই জায়গায় তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের আর একটি দিক সামনে আসে।

রাজনীতি শুধু নির্বাচনী ক্ষমতার প্রশ্ন নয়। সংবাদপত্রও শ্রেণিসমাজে একটি সংগ্রামের ক্ষেত্র। কে খবর তৈরি করবে, কার কথা প্রকাশিত হবে, শ্রমিকের জীবন কতটা দৃশ্যমান হবে, রাষ্ট্র ও পুঁজির সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠবে কি না—এসবও রাজনৈতিক প্রশ্ন।

অরুণা সেই অর্থে সাংবাদিকতাকে জনমত তৈরির এক প্রগতিশীল মাধ্যম হিসেবে দেখেছিলেন।

১৯৫৮ সালে দিল্লির প্রথম মহিলা মেয়র নির্বাচিত হওয়াও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রশাসনিক দায়িত্বের মধ্যেও নাগরিক জীবনের সমস্যা, জনকল্যাণ ও সামাজিক অধিকার তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় পদ তাঁকে তাঁর মূল প্রশ্ন থেকে সরিয়ে দেয়নি।

কারণ তাঁর কাছে ক্ষমতা ছিল লক্ষ্য নয়—মানুষের মুক্তিই ছিল লক্ষ্য।

## নারীকে ইতিহাসের প্রান্তে নয়, সংগ্রামের কেন্দ্রে

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নারীদের অনেক সময় 'ত্যাগী নারী' বা 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে স্মরণ করা হয়েছে। কিন্তু অরুণা আসফ আলির ক্ষেত্রে এই পরিচয় অসম্পূর্ণ।

তিনি কারও রাজনৈতিক সহচরী হয়ে ইতিহাসে প্রবেশ করেননি। তিনি নিজেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, আত্মগোপন করেছেন, রাষ্ট্রের দমননীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এবং স্বাধীনতার পরে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

তাই অরুণার  উত্তরাধিকারও কেবল নারীশিক্ষা বা নারী-অধিকার নিয়ে বক্তব্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর জীবন নিজেই ছিল একটি রাজনৈতিক বক্তব্য—

নারী নেতৃত্ব দেবে। নারী সিদ্ধান্ত নেবে। নারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। নারী সমাজ পরিবর্তনের কর্মী হবে।

এই অর্থে অরুণার জীবন ভারতীয় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইতিহাসেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

## আজকের সময়ে অরুণা : একটি পতাকা নয়, অসমাপ্ত সংগ্রামের উত্তরাধিকার

১৯৪২-এর ভারত আর আজকের ভারত এক নয়। প্রযুক্তি বদলেছে, রাষ্ট্রের কাঠামো বদলেছে, যোগাযোগের গতি অভাবনীয় হয়েছে। কিন্তু বৈষম্য, শ্রমের অনিশ্চয়তা, সম্পদের কেন্দ্রীভবন, নারী-নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও সামাজিক অসাম্যের প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত। তাই অরুণা আসফ আলিকে শুধু স্বাধীনতা দিবসের স্মৃতিচারণে, পোস্টার বা আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধায় আটকে রাখলে তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে বোঝা যায় না।

অরুণার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা—স্বাধীনতা কোনও সমাপ্ত অধ্যায় নয়। একটি দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে পারে, কিন্তু মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরাধীনতা থেকে যেতে পারে। সংবিধান সমানাধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারে, কিন্তু সম্পদ ও সুযোগের অসম বণ্টন সেই অধিকারকে বাস্তবে সীমিত করতে পারে। জাতীয় পতাকা সবার হলেও শ্রমের ফল যদি অল্প কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, তবে সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন থেকেই যায়।

এই কারণেই অরুণার জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে এসে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উত্থান, স্বাধীনতার পরে তা যুক্ত হয় শ্রমিকের অধিকার, অর্থনৈতিক সমতা, নারী-মুক্তি এবং শোষণমুক্ত সমাজের প্রশ্নের সঙ্গে। জাতীয় মুক্তিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি তিনি।

১৯৪২-এর গোয়ালিয়া ট্যাঙ্কে তাঁর হাতে ওঠা পতাকা তাই শুধু ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক নয়; তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবন সেই পতাকার অর্থকে আরও বিস্তৃত করেছে—সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা থেকে সামাজিক ন্যায়, জাতীয় স্বাধীনতা থেকে শ্রেণিমুক্তি, রাজনৈতিক অধিকার থেকে অর্থনৈতিক সমতার দিকে।

১৯৯৬ সালের ২৯ জুলাই অরুণা আসফ আলির মৃত্যু হয়। ১৯৯২ সালে পদ্মবিভূষণ এবং মৃত্যুর পরে ১৯৯৭ সালে ভারতরত্নে সম্মানিত হন তিনি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সম্মান তাঁর উত্তরাধিকারের শেষ কথা নয়। তাঁকে সত্যিকারের স্মরণ করার অর্থ তাঁর অসমাপ্ত প্রশ্নগুলিকে জীবিত রাখা।

কী অর্থে স্বাধীনতা মানুষের জীবনে পৌঁছল?
কার হাতে দেশের সম্পদ?
শ্রমের মর্যাদা কোথায়?
নারীর স্বাধীনতা কতটা বাস্তব?
সামাজিক সমতা কি কেবল সংবিধানের পাতায়, নাকি জীবনের বাস্তবতাতেও?

এই প্রশ্নগুলির মধ্যেই অরুণা আজও প্রাসঙ্গিক।

তিনি শুধু অতীতের বীরাঙ্গনা নন; তিনি একটি রাজনৈতিক উত্তরাধিকার, একটি অসমাপ্ত স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের কেন্দ্র এমন এক সমাজ—যেখানে স্বাধীনতা কেবল রাষ্ট্রের নয়, মানুষের; গণতন্ত্র কেবল ভোটের নয়, জীবনের; নারী কেবল ইতিহাসের চরিত্র নয়, ইতিহাসের নির্মাতা; শ্রমিক কেবল উৎপাদনের উপাদান নয়, সমাজের অধিকারী নাগরিক।

তাই ১৯৪২-এর সেই পতাকা আজও আমাদের কাছে শুধু স্মৃতির প্রতীক নয়। তা প্রশ্ন তোলে—স্বাধীনতার লড়াই শেষ হয়েছে, নাকি তার প্রকৃত সামাজিক অর্থ প্রতিষ্ঠার লড়াই এখনও চলছে?

অরুণা আসফ আলির জীবনের উত্তর স্পষ্ট—স্বাধীনতা অর্জনের দিন ইতিহাস শেষ হয় না। সেদিন থেকেই শুরু হয় তাকে মানুষের জীবনে সত্য করে তোলার দীর্ঘ সংগ্রাম।

# রেফারেন্স


- **Sumit Sarkar** — *Modern India: 1885–1947*, Macmillan.
  — জাতীয় আন্দোলন, গণআন্দোলন এবং ১৯৪২-এর রাজনৈতিক পরিস্থিতির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের জন্য।
- **Shashi Joshi** — *The Political Biography of Aruna Asaf Ali* / অরুণা আসফ আলির রাজনৈতিক জীবন ও বামপন্থী রাজনৈতিক বিবর্তন সম্পর্কিত গবেষণা।
  — তাঁর স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক অবস্থান বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
- **Indian National Congress / National Archives of India** — ১৯৪২-এর *Quit India Movement* সংক্রান্ত নথি ও ঐতিহাসিক দলিল।
- **National Archives of India** — *Quit India Movement, 1942* সম্পর্কিত সরকারি নথিপত্র।
  — গ্রেফতার, দমননীতি, ভূগর্ভস্থ আন্দোলন এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া যাচাইয়ের জন্য।

- **India Today** — *Remembering Aruna Asaf Ali, the Indian freedom fighter who was so ahead of her times* (16 July 2018)।
- **Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee et al.** — *India's Struggle for Independence: 1857–1947*, Penguin Books.